মানবিকতা - সর্বজনীন সংস্কৃতির দর্শন

অম্লান দত্ত

বর্তমান পৃথিবীতে একটি বিষয়ে বোধহয় সমস্ত মানুষের একমত হওয়ার কথা তা হল সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ কোন দিন একই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হবে না -- সকলেই একটি ধর্মকে গ্রহণ করবে না , সকলেই এক টি মতবাদে বিশ্বাস করবে না, একই রকম ভাবনায় ভাবিত হবে না ।

কিছুদিন আগে প্রাচ্য ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে পোপ সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, খৃষ্টের জন্মের প্রথম সহস্রাব্দে পাশ্চাত্য দেশ খৃস্টান হয়েছে, দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আমেরিকা খৃস্টান হয়েছে ; তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রাচ্যদেশ খৃস্টান হবে। এমন ধারনা ইসলামের পক্ষ থেকেও প্রকাশ করতে দেখা যায় । কয়েক শত বছরে ইসলাম যেভাবে দ্রুত বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ইসলাম ধর্মের নানা শাস্ত্রীয় বাণীতে যে ভাবে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে তাতে ইসল ামেরও বিজয়ের স্বপ্ন রয়েছে। কিন্তু এই জাতীয় ভাবনা বোধহয় বর্জন করাই শ্রেয়। মধ্যযুগে নানা কারণে নবীন দুই ধর্মের যে বিস্তার ঘটেছে তেমন পরিস্থিতি আর দেখা দেওয়া সম্ভব নয় । এরই পাশাপাশি কিছুদিন আগে বৌদ্ধধর্মের দলাই লামার কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি বলেছেন, আপনি বুদ্ধের নাম না নিন তাতে কিছু এসে যায় না, আপনি বৌদ্ধধর্মের নাম না নিন তাতেও কিছু এসে যায় না, কিন্তু আপনি কণায় বিশ্বাস না করলে অবশ্যই কিছু এসে যায় । এই যে স্বধর্মের দিকে বিকে আকৃষ্ট না করে মানুষের ধর্ম সবাইকে ভালবাসা, সমস্ত জীবে কণা করা এটাই কাম্য, এটাই মানবতা। এখানেই ধর্মীয় সম্প্রদায়গত চেতনা আর মানবিক চেতনার সম্পর্ক। কেউ ধর্ম বিশ্বাস করবে, কেউ ধর্মকে অগ্রাহ্য করবে, কেউ নাস্তিক হবে, এটাই স্বাভাবিক। এটাই বর্তমানে মানুষের বহুত্ববাদী অবস্থানের শর্ত । পৃথিবীতে সবাই একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মেও যেমন যেতে পারে না, পৃথিবীতে সবাই নাস্তিক হবে এমনও বোধহয় সম্ভব নয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে এক সময় ভাবার মতো প্রচার চলেছিল, সারা পৃথিবী একদিন মার্কসবাদী হয়ে যাবে। সে সম্ভাবনার কথা এখন আর মনে করার অবকাশ নেই। মূল কথা হল, সবাইকে এক বিশ্বাসে, এক আবরণে ফেলে দেওয়াটাই বোধহয় যায় না। যাবেও না, যাওয়া সম্ভবও নয়। এই বোধে পৌঁছানোটাই হল মানব বোধে পৌঁছানো। কোন সম্প্রদ ায়গত চিন্তা নয়, কোন ধর্ম সম্প্রদায়গত চিন্তা নয়, কোন মতাদর্শগত চিন্তা নয় — মানুষের চিন্তা হল সমস্ত রকম ভাবধারা নিয়ে চলা । এটাই অংশগত অবস্থান থেকে সমগ্রের অবস্থানে পৌঁছে যাওয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ াত্মপরিচয় অক্ষুন্ন রেখেও সকলের একত্র অবস্থানকে মেনে নিয়ে এক মানবিক অবস্থানে পৌঁছে যাওয়া। এই বোধে পৌঁছানো ছাড়া বোধহয় মানুষের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। মানুষের আত্মরক্ষার জন্য, অস্তিত্বের জন্য মানববোধে, বিবোধে উপনীত হওয়া আজ অপরিহার্য ।

পৃথিবীতে অনেক কথাই, বহু কাজের কথাও আজ আর আঞ্চলিক ভাবে উচ্চারিত হয়ে লাভ নেই। মানবাধিকার কোন অঞ্চলের বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না । পরিবেশ চেতনা কোন সম্প্রদায়গত চেতনায় সীম াবদ্ধ থাকলে তার সার্থকতা নেই। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। এই বৃদ্ধি রোধ করার চেতনা ও কর্মযজ্ঞ গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের করণীয়। পরিবেশ চেতনা, মানবচেতনা, বিবোধ ছাড়া অর্থহীন ।

সাম্প্রদায়িক ভাবে গোষ্ঠিবদ্ধ ধর্মতেও অনেক কথা আছে, অনেক আচরণের নির্দেশ আছে তা আঞ্চলিকতা, সমসাময়িকতার উর্দ্ধে— যা সমস্ত মানুষের জন্য এবং চিরকালীন। মানুষকে ভালবাসার কথা, পৃথিবীকে সমস্ত মানুষের বাসযোগ্য স্থান হিসাবে গড়ে তোলার কথা, সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা হলেও তা সমস্ত মানুষের। আবার ধর্মে এমন অনেক কথা আছে যা যুক্তি দিয়ে দেখলে অর্থ নেই। ইসলামে সাম্যের কথা আছে আবার পুষের চারটি বিবাহের কথা আছে। সাম্য দাবী করবে নারীরও চারটি পুষকে বিবাহের অধিকার। এই রকম দেখা যাবে ধর্মে এমন অনেক কথা রয়েছে যা যুক্তিপূর্ণ নয়, বর্তমানে তা তাৎপর্যহীন , বহু বাক্য পরস্পর বিরে াধী। এমন বিষয়গুলি বর্জনকরাই ভাল। সেই সমস্ত বিষয় গ্রহণীয় যা সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। খৃস্টান ধর্ম বলে, প্রতিবেশীর সাথে এমন আচরণ করবে না যা তুমি প্রতিবেশীর কাছে আশা কর না । এ বাক্য সমস্ত ম ানুষের জন্য। এই সব কথায় ধর্মীয় অবস্থান মানবিক, সম্প্রদায়গত নয় ।

মানবিকতার মূল বিষয় হল যার যার অবস্থান, যার যার বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে এমন বিষয়গুলি অনুসরণ করা যা সকলের কল্যাণকে লক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরে। এ ছাড়া বোধহয় মানুষের সামনে অন্য কোন পথ নেই। আমার যুক্তি আমার কাছে, তোমার যুক্তি তোমার কাছে এমন ভাবলে একত্রে চলা যাবে না — তাতে সংঘর্ষ হবে, দ্বন্দ্ব হবে, অশান্তি হবে। কাজেই প্রত্যেককেই কিছু বর্জন করতে হবে, বর্জন করা জানতে হবে এবং সকলের সাথে একত্রে চলার জন্য গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ করতে হবে। এমন এক সংস্কৃতি আমাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যেখানে সম্প্রদায়গত চিহ্ন প্রধান না হয়ে , সমস্ত মানুষের সংস্কৃতি হবার বিষয় প্রাধান্য প াবে। তা কোন ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলে গড়ে তোলা যাবে না — মানবিকতার বড় জায়গায় এলেই তা গড়ে তোলা যাবে ।

যে প্রশ্নটা সামনে আসা দরকার সেটা হল ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্ন। এ-বিষয়ে ভাল আলোচনা রয়েছে রাসেলের বই 'পাওয়ার'-এ। সমাজে অসাম্যের মূলে একটা বড় জিনিস হল ক্ষমতার অসাম্য। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা বেশী, অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কম। অত এব যার হাতে ক্ষমতা বেশী তার ইচ্ছাই বলবৎ হয়। যার ক্ষমতা কম তার ইচ্ছা উপেক্ষিত হয় ।

কী কারণে এই ক্ষমতার অসাম্য ঘটে তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। মার্কসের ভাবনা হল, ক্ষমতার পার্থক্যের মূলে আছে সম্পত্তির উপর অধিকার। যার সম্পত্তি বেশী তার ক্ষমতা বেশী। যার সম্পত্তি নেই তার ক্ষমতা

কম। এই ধারণা ব্যবসায়িক সংস্কৃতি, ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। বন্টনে অসাম্য থেকে এই পার্থক্য ঘটে। এই ধারণা বোধহয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এই ধারণা ঠিক দেখাতে হলে তথ্যের উপর জোর দেওয়া দরকার । বিপরীত উদাহরণ দেখা যাক — এই ধারনা দিয়ে স্তালিনবাদী সমাজে ক্ষমতার অসাম্য এল কী করে তা জানা যায় না, এখানে কারণ বোধহয় সম্পত্তি নয়। এখানে ক্ষমতার মূলে রয়েছে পার্টিসংগঠন। দলীয় সংগঠনের হাতে ক্ষমতা , তার নেতার হাতে ক্ষমতা এর কারণ। এটা সম্পত্তির কারণে নয়। ব্যবসায়িক বা ধনতান্ত্রিক সমাজের থেকে এটা ভিন্ন। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলে এই সমাজকে দেখার চেষ্টা হয় বটে। তবে তা একটা তত্ত্ব বাঁচাতে পারে মাত্র। অন্য প্রান্তে তাকালে দেখা যাবে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে নানা জাতি, আর্যদের ধরেই এখানে যে সভ্যতা ছিল তার উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। তার মূলে কোন সম্পত্তি ছিল না। ছিল যোদ্ধার ক্ষমতা ও দক্ষতা। আর্যেরা মহেঞ্জদারো সভ্যতার সম্পত্তি থেকে অধিকতর সম্পত্তির অধিকারী ছিল না । তাদের ক্ষমতার দক্ষতার মূলে সম্পত্তি ছিল না। খৃষ্টান সমাজেও খৃষ্টান চার্চের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তার প্রধান কারণ সম্পত্তি নয়। পরে তারা সম্পত্তি অধিকার করেছে। আর্যসমাজে সকলেই ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করত । এই শ্রদ্ধা সম্পত্তির কারণে নয়। তাদের জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করত বা তারা শাস্ত্রীয় দিক থেকে ভয় সৃষ্টি করে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত । সাধারণ মানুষের মনে ভয়কে জাগ্রত করে তারা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এক এক স্থানে, এক এক দেশে এক এক রকম ভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-যুগে ব্যবসায়িক যুগে সম্পত্তি দিয়ে ক্ষমতা লাভ করা যায় ।

মানবিকতার অবস্থান এর বিপরীতে। মানুষের মানুষ বলেই কিছু অধিকার থাকা উচিত। কোন ব্যক্তি ক্ষমতার সংগঠনে যেখানে অবস্থান করে সেখানে তার অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়। শাস্ত্রীয় ভাবে, যেভাবে অধিকার দেওয়া হয় তা রাইটস্ অফ্ ম্যান নয় । মানুষের অধিকারের কথা অল্পদিন আগের, বলা যায় ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের পরে । এর প্রভাব পড়েছে আমেরিকার সংবিধানে। মানুষের কিছু প্রাথমিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সনদেও রাইটস্ অফ্ ম্যান ঘোষিত। জাতিপুঞ্জে মানবাধিকার গৃহীত। মুখে এটা অনেক সমাজেই স্বীকৃত। স্বীকৃত আমাদের সমাজেও। তত্ত্বগত ভাবে মানবিকতার ধারনা গৃহীত। আসলে তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি। বাস্তবে যে ক্ষমতার সংগঠন আছে তা নিয়েই অধিকার গৃহীত। মনু যেমন লিখে বৈষম্য নির্দিষ্ট করেন আজ আর তেমন ভাবে লিখে কখনও করা যায় না ।

আম্বেদকর ভারতের জন্য যে সংবিধান করে দিলেন তা মানবিক। কিন্তু তা কার্যকরী করা আজও হয় নি। বাস্তব ঘটনা হল ক্ষমতার অসাম্য। মানবিকতার ধারনা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন ক্ষমতার বৈষম্য দূর না করলে মানবতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না ।

আগের দিনে ক্ষমতার অসাম্যের কারণ হল রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। গত দুশ বছর ধরে বলা যায় রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। হিটলারের সময়ে, স্তালিনের সময়ে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীকরণ হল। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে দেখলে কোন শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ হয়। একচেটিয়ার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয়। দুটিই লক্ষ্য করার মত। একটাকে অন্যটার ফল হিসাবে দেখা ঠিক নয়। নতুন সমাজের গঠন কী হবে, তার সাথে এই ক্ষমতার অসাম্যের সম্পর্ক আছে ।

সাম্যের দিকে যেতে হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। সাম্য না এলে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের যে বিকার ঘটল তার কারণ সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে তোলা হল। 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা' নাম দিয়ে লেখাতে তিনি এই কথা বলেছিলেন। গান্ধীজী বলেছিলেন, রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা বৃদ্ধি আমি দুশ্চিন্তার কারণ হিসাবে মনে করি। দুজনের কথাই হল নীচের দিকের মানুষের ক্ষমতা পাওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পল্লীসংগঠন, গান্ধীজী বলেছেন গ্রামসংগঠন। নীচের দিকে ক্ষমতা থেকেই উপরের দিকে ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। কিন্তু বর্তমানে অবস্থাটা রয়েছে, উপরের ক্ষমতাবানেরা নীচের দিকের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। ফলে শেষ বিচারে গ্রামের হাতে ক্ষমতা পৌঁছাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়, গ্রামের আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। নীচের দিকে আত্মনির্ভর হলেই উপরের দিকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অবশ্য নীচের দিকে ক্ষমতা দিলেও তাদের যোগ্যতার প্রশ্ন আছে। নতুন করে যেখানে লোকাল টাইর‍্যান্ট তৈরী হতে পারে। হলও তেমন। কাজেই শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও পল্লীসংগঠন একত্রে বলেছেন । এর জন্য ব্যাপক আকারে সাংস্কৃতিক বিপ্লব দরকার। তলার দিকের মানুষের ভিতর যে কুসংস্কার রয়েছে তার অবসান প্রয়োজন। না হলে নিজ নিজ অঞ্চলে অত্যাচারিত শক্তির আবির্ভাব ঘটবে। শুধু সংগঠন দিয়ে, সাংগঠনিক কাজ দিয়ে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরিবর্তন আনতে হবে দর্শনে, সংস্কৃতিতে ।

প্রশ্ন এসে যায়, মানব প্রকৃতির কতটা পরিবর্তন সম্ভব ! মানব প্রকৃতির স্বভাবে রয়েছে স্বার্থ। মনে হয়, এটাই মানব প্রকৃতি। এটা ঠিক যে ক্ষমতা স্পৃহা মানুষের আছে। তা সামাজিক ক্ষমতাবানদের ভিতর এক ভাবে দেখা যায়, ক্ষমতাহীনদের ভিতর অন্যভাবে প্রকাশ পায়। পুষ যে নারীর উপর প্রভুত্ব করতে চায় এটা তো দেখাই যায়। এটা কীভাবে বদলানো যায় তা দেখা দরকার। ক্ষমতার বিষয়টা সেই কারণে বিশেষ জটিল।

মানুষের আত্মবিকাশের পথ একই হবে এমন মনে করবার কারণ নেই। কেউ হয়ত বিকশিত হবে শিল্পে-গানে, কেউ সংগঠনে, কেউ খেলায়, কেউ বিজ্ঞানে— প্রত্যেকের নিপুণতা যার যার মত বিকশিত করবার সুযোগ পাবে এটা একটা কথা । আর যে যেমন করে পারবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে এটা আর এক কথা । দ্বিতীয় উপায় হল সংঘর্ষের পথ, যুদ্ধের পথ। এখন অবশ্য এমনই হয় । যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারাই বিকশিত হবার জন্য সব ক্ষমতা এমন কি অস্ত্র প্রয়োগ করে ।

এটা দূর করার জন্যে সাম্য ও মানবাধিকার - এর দর্শনকে সামনে আনতে হবে। এটা নেতিবাচক দিক থেকে বলা। এমন না করলে সমাজে নানারকম অসুবিধা হয়। আর ইতিবাচক দিক থেকে বলা হল, মানুষের জীবন অনেক সুন্দর হতে পারে। তা ফুটিয়ে তোলা দরকার। সংঘর্ষের পথে সকলেরই ক্ষতি । এর ফলে যারা প্রভুত্ব করে তারাও যে সুন্দর জীবনে পৌঁছাতে পারে তাও তারা পারে না । এই ভাবে ধ্বংসের ধারনাগুলো তুলে ধরা ও তা থেকে বিরত হবার আহ্বান রাখা। ইতিবাচক দিক — সুন্দর, পূর্ণাঙ্গ, শান্তিপূর্ণ জীবনের চিত্র তুলে ধরা। বারেবারে, নানারকম ভাবে; এটাই নতুন জীবনদর্শন, মানবতার দর্শন।

বুদ্ধ অতীতে এই ভাবেই বলেছেন। মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তকেরাও এই ভাবেই বলেছেন। নেতিবাচক দিকে বলার বিষয় অনেক হয়ে গেছে। আগে ধ্বংসের সম্ভাবনা ছিল আঞ্চলিক। আজ ধ্বংসের চেহারা বৈশ্বিক। যেমন পরিবেশ ধ্বংস কোন আঞ্চলিক ধ্বংস নয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরা যায় ।

মানবতাবাদের চিন্তা আজ নতুন স্তরে পৌঁছে গেছে। পুরানো চিন্তা ধর্মীয় উন্মাদনা তা বুঝছে না। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছে ক্ষমতা-গোষ্ঠীর সম্পর্ক। মানবতাবাদের কথা বলতে গেলে ধর্মান্ধতার বিদ্ধতা করা প্রয়োজন। ধর্ম স্বনামে আজ সংঘর্ষে এসে দাঁড়াচ্ছে। ইসলাম সরাসরি ধর্মের নামে সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে। এ-সব বিষয়ও আজ আর আঞ্চলিক থাকছে না । মানবাধিকারের বিষয়টি তাই সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেই।

এই মানবতার কথা নিরীশ্বরবাদী হয়ে বলা যেতে পারে। উদার ধর্মের কথা বলেও তা বলা যেতে পারে। উদারতার জায়গায় সকলেরই আসা ভাল। প্রাধান্য দিতে হবে মানবিক সংস্কৃতি কী করে রক্ষা পেতে পারে সেটাই খুঁজেই বের করা এবং সেটাই সকলের করণীয়। কারো কোন কাজ বিচার্য হবে এইভাবে যে, তার কাজ বিভেদ সৃষ্টি করবে, না সম্প্রীতি বৃদ্ধি করবে। এটাই প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচার্য। মিলন ঘটার দিকে গেলে তা মানবতার দিকে যাবে, বিভেদ বাড়ানোর দিকে গেলে তা মানবতা বিরোধী হবে। বন্ধনকে অতিক্রম করে মানব পরিচয়ে মিলনের পথেই আসে মানবতা। আসে মুক্তি। মহাবিশ্বের সাথে মিলনেই মানবতার উত্তরণ ।

(শ্রদ্ধেয় অম্লান দত্তর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সরাসরি অনুলেখনটি রূপ দেন নির্মল ঘোষ — সম্পাদক)

নানা পরিচয়ে মানুষকে বিভক্ত করা নয়
মানব পরিচয়ে সকলেই মানুষ হয়ে উঠুক ।।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com